The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 139-154, ISSN 2306-3920

নলিনী বেরার ছোটগল্প : প্রান্তজনের আখ্যান

(Short Stories of Nalini Bera : The Narratives of The Marginalized)

তৃপ্তি সরকার*

সার-সংক্ষেপ : বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরা (জ. ১৯৫২) এক স্বতন্ত্র নাম। সত্তরের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে যে নবযাত্রা তার অন্যতম সহযাত্রী তিনি। এই সময়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার যে চেষ্টা চলেছিল সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বদলে গিয়েছিল বাংলা কথাসাহিত্যের গতিমুখ। এক ঝাঁক নতুন লেখক উঠে এসেছিলেন নানান জেলা থেকে। তাঁদের লেখায় রূপ লাভ করেছিল চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার মত গাঁ-গঞ্জের মাটির কাছাকাছি মানুষের আখ্যান। এসব লেখার জাত এবং ধাত উভয়ই আলাদা। স্বভূমি, স্বজনদের জীবনচরিত, তাদের পাওয়া না-পাওয়ার গল্পকে শিল্পরূপ দান করেছিলেন তাঁরা। এই সময়েই ওড়িশা ঘেঁষা মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছিলেন নলিনী বেরা। যিনি আশৈশব আপণ ভূখণ্ডটিকে দেখেছেন পরম মমতায়, পড়েছেন নিজ অঞ্চলের পুরাণ, ইতিহাস আর যাপন করেছেন ঐ অঞ্চলের লোকজ জীবন। আর তারই শিল্পরূপ দানে ঋদ্ধ করেছেন আপণ সংস্কৃতিকে। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখা নদী তীরের বিচিত্র জনপদের বৈচিত্র্যময় জীবনচিত্র অংকনই শুধু নয়, বরং তাদের প্রান্তীয় জীবনজিজ্ঞাসার সুতীব্র উচ্চারণে তাঁর গল্প কীভাবে হয়ে উঠেছে প্রকৃত ভারতীয় বাস্তবতার শিল্পরূপ তারই অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য। উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় বর্ণনামূলক, তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

ভারতবর্ষের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোধা-ভুঁইয়া-ভূমিজ-কাম্‌হার-কুম্‌হার-সাঁওতাল অধ্যুষিত অখ্যাত গ্রাম বাছুরখোঁয়াড়-এ কুম্ভকার (কুম্‌হার) সম্প্রদায়ের এক দরিদ্র চাষী পরিবারে জন্ম নলিনী বেরার। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রে অঞ্চলটির একটি পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা আর ঝাড়খণ্ডের মিলনক্ষেত্র এই অঞ্চল। অনার্য প্রধান এই গ্রামের মানুষজন মূলত প্রান্তিক শ্রেণির। অর্থনৈতিকভাবে ভারতের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গেও এদের দূরত্ব মেরুপ্রতিম। রাষ্ট্র-সভ্যতার দিক-চিহ্নহীন এই মানুষগুলো নিরক্ষর সমাজের প্রতিনিধি। আমাদের শিক্ষিত শহুরে আধুনিক মানুষের কাছে যাদের জীবনযাত্রা প্রায়ই অদ্ভুত লাগে। এই প্রায় অচেনা মানব গোষ্ঠী যারা অশিক্ষায় দারিদ্র্যে স্থবির; যারা অস্বাস্থ্যে অপুষ্টিতে ভঙ্গুর; যাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে আছে তুকতাক, নলচালা, বাণমারা, তেলপোড়া, ভূতপ্রেত, ওঝা-গুনিন; যাদের শুধু আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকতার বিরুদ্ধেই নয়, লড়তে হয় ভাষাগত প্রান্তিকতার বিরুদ্ধেও – তাদেরই জনজীবন গল্পকার নলিনী বেরার গল্পের প্রেক্ষাপট।

* **ড. তৃপ্তি সরকার :** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অভিধানে 'প্রান্তিক' বা 'প্রান্তীয়' শব্দের অর্থ করা হয়েছে প্রান্তবর্তী বা প্রান্তসম্বন্ধীয় অথবা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই শ্রেণির প্রান্তে বা সীমায় অবস্থিত অর্থে। প্রান্তিকের ধারণা যদি আমরা মেনে নিই তবে তার বিপরীতে পাই কেন্দ্রের অবস্থান। এখন প্রশ্ন হলো কেন্দ্র কী? আর প্রান্তই বা কী? আপাত সরল কিন্তু গভীর-জটিল এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা আজকের পৃথিবীতে ভীষণ জরুরি। কারণ সাধারণ অর্থ দিয়ে আজ আর এসবের ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। বরং আর্থ-রাজনৈতিক ভাবে কীভাবে এই কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণা তৈরি হচ্ছে বা এদের মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াগুলোই বা কী তা জানা প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় 'প্রান্তিকতা' হচ্ছে মানুষের চরম নিম্নাবস্থা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসূচকে যাদের কোনো অংশগ্রহণ বা অর্জন থাকতে পারে না। মৌলিক চাহিদা পূরণসূচকেও যাদের অবস্থা শোচনীয়। শ্রেণিগত, পেশাগত কিংবা জাতিগত যে কোনো অবস্থাগত কারণে সমাজ যাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে। শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধির বলয়ে প্রবেশ না করতে পারা নিরক্ষর-অনগ্রসর-সহজাত আদিমতা-নির্ভর মানবসমষ্টিতে যাদের অবস্থান তারাই প্রান্তিক। অর্থাৎ 'প্রান্তিকতার সাথে জড়িত থাকে সমাজের তথাকথিত মূলধারার আধিপত্যবাদী ক্ষমতাকাঠামো।' (মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা ২০১৪ : ৪৫)। এই নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাকাঠামো জাতিগত বা পেশাগত প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া জারি রাখে। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা আর আধুনিক পুজিঁবাদী কাঠামোর সভ্যতার ধারণা রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এই প্রান্তিকীকরণকে ত্বরান্বিত করে। সমালোচকের মতে-

> 'অনুন্নত', 'উন্নয়নশীল' ও 'তৃতীয় বিশ্ব'-খ্যাত রাষ্ট্রগুলোতে প্রধানত দুই ধরনের প্রান্তিকীকরণ ঘটে : ১. 'প্রথম বিশ্ব' বা ইউরোপ-আমেরিকার সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্যের ফলে প্রান্তিকীকরণ; ২. 'অনুন্নত', 'উন্নয়নশীল' বা 'তৃতীয় বিশ্ব'র রাষ্ট্রগুলোর উর্ধ্বতন শ্রেণীকর্তৃক অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণী/সম্প্রদায়/জাতির ওপর সংঘটিত প্রান্তিকীকরণ। (সুমন সাজ্জাদ ২০১১ : ৪৬)

মূলত ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত দেশকে অনুগত বা বাধ্য রাখার এক নতুন কৌশল এই ক্ষমতা বলয়। ঔপনিবেশিক যুগেই এই কেন্দ্র আর প্রান্তের ধারণা বিদ্যায়তনিক বৈধতা লাভ করে। রেনেসাঁস-পরবর্তী ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যের বিস্তার, অধিকৃত ভূখণ্ডের সম্পদ লুণ্ঠন ও খ্রিস্টধর্ম প্রচার। কিন্তু সেই গভীরতর সত্যকে আড়াল করার জন্য এক ধরণের রীতিসিদ্ধতার প্রয়োজন ছিল। যা তাদেরকে আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার একটা গ্রহণযোগ্য ও উচ্চমার্গীয় সমাধান দিতে সক্ষম হবে। ফলে তৈরি হল সমাজবিদ্যার এক নতুন একাডেমিক ডিসিপ্লিন, যাকে আজ আমরা নৃবিজ্ঞান বলি। এর উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানচর্চা মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তার প্রয়োগ ঘটল ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে আর তাদের শাসনকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বৈধতা দিতে। সমালোচকের ভাষ্যে, 'সমাজবিদ্যার ঐ নতুন শাখা সমগ্র মানবমণ্ডলীকে বিভাজিত করতে শুরু করল, জাতিগত ধারণায়, রংগত ধারণায়, চুলের প্রকৃতিগত ধারণায়, কপালের বিস্তারের ধারণায়, নাকের গড়নগত ধারণায়। আর ঐ বিভাজন ভিত্তি করেই সৃষ্টি হল আর্য, অনার্য বা সঙ্কর অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা মিশ্রিত জাতির ধারণা।' (আমিনুর রহমান ২০১৪ : ১৮৪)। বলা হল বিশ্বে যা কিছু সুন্দর, মানবিক এবং যৌক্তিক তাতে কেবলমাত্র সাদা বা পশ্চিমাদের অধিকার ; আর বাকি বিশ্ব শুধু অসুন্দরই নয় তারা অসভ্য, বর্বর, অমানবিক, অপরাধপ্রবণ, ভীতু, আর অলস। তারা প্রতিষ্ঠা করল ইউরোপ হল কেন্দ্র আর বাকি বিশ্ব হল প্রান্ত। প্রান্তের যত গতি-অগ্রগতি-দুর্গতি সবই নির্ধারিত হতে শুরু করল উপনিবেশকের সন্ধি-অভিসন্ধি-দূরভিসন্ধির ভিত্তিতে। এমনকি উপনিবেশ-পরবর্তী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে অভিধা দেয়া হলো 'তৃতীয় বিশ্ব' ও 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, পূর্বাপর শাসকের শোষণ প্রক্রিয়া একই ধরণের। যেমন- ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতীয় বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি

বিশ্লেষণ করে ফ্রাঞ্জ ফানো দেখান তারা কীভাবে আফ্রিকাকে বর্বর হিসেবে উপস্থাপন করেছে, বর্ণবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেওয়া সশস্ত্র আন্দোলনকে ঔপনিবেশক শক্তি বলেছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। কিংবা পাকিস্তান পর্বে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকেও চিহ্নিত করা হয়েছিল দেশদ্রোহিতা হিসেবেই। আবার স্বাধীন ভারতে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ নকশালকে দমন করতে সরকার পক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ অনেকাংশে ঔপনিবেশিক কায়দাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকেন্দ্রিক যে বিতর্ক তারও চারিত্র্য অভিন্ন। কেননা উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রকাঠামোর শাসনপ্রণালী, নির্যাতন ও বিচারব্যবস্থা প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনকেই মান্য করে।

প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণা এমন এক ধরণের বৈপরীত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে কেন্দ্রের ক্রিয়াকাণ্ড প্রান্তের এলাকার উপর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য বিস্তার করে।

বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, এর আদিতম নিদর্শন চর্যাপদে চর্যাকারগণ নিজেরাই ছিলেন ডোম্বি, কামলি, শবর প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। প্রাবন্ধিক রণজিৎ করের মতে, 'প্রাপ্ত সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাপদের তেইশজন পদকর্তার অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রম ধর্মের বাইরের প্রান্তিকজন নয়ত বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি।' (২০০৯ : ৪৬)। আর চর্যার পাত্র-পাত্রীগণও ডোমনী, শবরী, শুন্ডিনী, ব্যাধ, জেলে, চন্ডাল, পুলিন্দ প্রভৃতি অস্পৃশ্য নিম্নবর্গভুক্ত। তবে সিদ্ধাচার্যগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ এবং ধর্মাচারের দিক থেকে বেদবহির্ভূত হলেও তারা যে উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন তার প্রমাণ মেলে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে প্রান্তজনের কথা। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখেন 'প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে জোড় হাতে। / আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' এই পাটুনি পেশাগতভাবে প্রান্তজনেরই প্রতিনিধি।

পরবর্তীকালে সাহিত্য আঙ্গিনায় নিম্নবর্গীয়দের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বহু শতাব্দী। তবে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিলেন মহাকবি মধুসূদন দত্ত। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য*-এ রামের বন্দনা নেই, রাবণ সেখানে মহান সম্রাট। বিদ্যায়, প্রজ্ঞায়, সাম্যে তিনি রামকে অতিক্রম করে যান। ভিখারী রাঘবকে মহাকবি দাঁড় করান বিনা অপরাধে শূদ্রঋষি শম্বকের হত্যাকারী বা নির্দোষ বালির ঘাতক হিসেবে। লক্ষণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশকে চিহ্নিত করেন তস্করের আগমণের মতো। তিনি পৌরাণিক কাহিনির উল্টো পিঠ পড়ার আহ্বান জানালেন বাঙালি পাঠককে। মদ্রাজ অবস্থান কালে মধুসূদন শিখেছিলেন এই কৌশল। আমরা দেখি দক্ষিণ ভারতে অনার্য রাবণ শুধু পূজিত বীরই নয় মহান স্রষ্টাও বটে। তার গায়ে আসুরীয় কলঙ্ক একেবারেই নেই। তিনি সেখানে ভূমিপুত্র। মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাবনা নিয়ে এলেন এবং পৌরাণিক আখ্যান পাঠের নবদৃষ্টি দান করলেন।

পরবর্তী সময়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), প্রমুখ লেখকেরা লিখলেন সমাজের অবহেলিত ব্রাত্যজনের অনালোচিত জীবন যন্ত্রণার কাহিনি। এঁদের অনেকেই আবার জন্মসূত্রেই প্রান্তজন। ফলে প্রান্তজনের সমমর্মিতার যাপিত দলিল হয়ে উঠল তাঁদের সৃষ্টিকর্ম। যাপিত জীবনে এবং সৃষ্টির বিষয় বস্তুতে অন্ত্যজ পরিবারে জন্ম নেয়া নলিনী বেরা যেন তাঁদেরই উত্তরসূরি। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্যে–

> নবীন প্রজন্মের গল্পকারদের মধ্যে এক ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। একদল লেখক যাঁরা চাকুরিসূত্রে বহুবছর গ্রামে থেকে গ্রামজীবন ও মানুষকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে ধরেছেন,

> অপর দলের লেখক গ্রামেরই মানুষ, তাঁদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে গ্রামজীবন ...
> নলিনী বেরা দ্বিতীয় বর্গের লেখক। (২০১৫ : ৫০৪)

পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগ-পরবর্তী পঞ্চাশের দশকে মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবনভাষ্যে এক অস্থির, অশান্ত, স্বস্তিহীন সময়ের ভাঙাগড়ার শিল্পরূপ হয়ে উঠল বাংলা গল্প-উপন্যাস। এইপর্বে *দেশ* পত্রিকা বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাগুলি। সদ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা স্থান পেয়েছিল এই সময়ের গল্পে। তরুণ গল্পকার যাঁরা তখন গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২) লিখলেন মধ্যবিত্ত জীবন সংকটের গল্প। ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত প্রাধান্য পেল তাঁদের গল্পসমূহে। আবার *পরিচয়* আর *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় লেখা হলো বিশেষত শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিন্যাসের গল্প। অনেকেই আবার ফিরে গেলেন ইতিহাস, লোককাহিনি আর মিথের ভাঙাগড়ার জগতে। যেমন- মহাশ্বেতা দেবী। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পের যে ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন মূর্তি তা ধরা পড়ে তার বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্যে এবং এক বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার প্রয়াসে যেমন, তেমনি ছোটগল্পের অঙ্গসৌষ্ঠবকে নানান মাত্রায় ভেঙেচুরে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেও।' (বীরেন্দ্র দত্ত ২০০৪ : ৫৯৫-৫৯৬)।

ষাটের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে একই সাথে জনপ্রিয়, শাস্ত্রবিরোধী এবং প্রগতিশীল সমাজমনস্ক ধারা প্রবহমান থেকেছে। এই সময়ের পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭-৭২)। এই আন্দোলনের বিস্ফোরণ সত্তর দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে। মহাশ্বেতা দেবীর উল্লেখ এ প্রসঙ্গে আবশ্যিক মনে করি। এই আন্দোলনের সমস্ত সদর্থক দিকগুলি এসে মিশেছিল তাঁর *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪) উপন্যাসসহ ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'অপারেশন বসাই টুডু', 'জল', 'দ্রৌপদী', 'এম. ডব্লু. বনাম লখিন্দ', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'স্তনদায়িনী' গল্পে। এই সময়ে তাঁর গল্প-বয়ন-রীতিও বিশিষ্ট। অন্তেবাসী শোষিত জনগণের পক্ষে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছিল সর্বশ্রেণির শব্দযুক্ত, বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের হাতিয়ার।

নকশাল-পরবর্তী সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে যেমন অস্থিরতা ও বিপর্যয় দেখা গিয়েছে, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য আর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। স্বপ্নসৃষ্টি, স্বপ্নভঙ্গ, ঐতিহ্যপতন, মূল্যবোধের রূপান্তর, ক্ষমতার রদবদল– সব মিলিয়ে এই সময়পর্ব সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত সত্তরের দশক যেন লেখকদের অতি মাত্রায় সময়-সচেতন করে দিল। সাহিত্যে সত্তরের দশকটি মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও বিত্তহীন, উপার্জনশূন্য, আদিবাসী, ক্ষেতমজুর, ভিক্ষুক, দিন-খাটা এইসব মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা হল। তাদের কথা তাদের মত করে বলবার প্রয়াসে ষাটের গল্পহীন ছোটগল্প-উপন্যাসে আবার ফিরে এল আখ্যানধর্মিতা, বিবৃতিময় সারল্য; চরিত্রেরা হয়ে উঠল স্বাভাবিক ও জীবন্ত। কাহিনির পটভূমি নগরকেন্দ্রিকতার পাশাপাশি অনেকাংশে ছড়িয়ে পড়ল উত্তর থেকে দক্ষিণ গ্রামাঞ্চলে। এই গ্রাম রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিভূতিভূষণের দেখা প্রকৃতি-নিবিড় শান্ত গ্রাম নয়; সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাসূত্রে বাঁধা, পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত, ভোটাধিকার সচেতন, বহু সুযোগ-সন্ধানী রাজনৈতিক দলের হানাহানিতে ক্লিষ্ট, চিরদরিদ্র, নিরক্ষর, নিরন্ন মানুষের গ্রাম। (সুমিতা চক্রবর্তী ২০০৪ : ৮০-৮২)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো বীরভূমের গ্রামই একমাত্র এর যথার্থ পূর্বসূরি। অর্থাৎ দেশের সমাজ, রাজনীতি আর সংস্কৃতির সঙ্গে সর্বশ্রেণির মানুষের গল্পকে যুক্ত করে দেখার প্রবণতাই সত্তর-আশির দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের মৌলচেতনা। পূর্বোল্লিখিত প্রবীণ গল্পকার যারা এই সময়েও লিখছেন

তাঁদের পাশে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকার হিসেবে অভিজিৎ সেন (১৯৪৫), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮), জয়ন্ত জোয়ারদার (১৯৪৮), নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮), অমর মিত্র (১৯৫১), আবুল বাশার (১৯৫১), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১), কঙ্কাবতী দত্ত (১৯৫১), কিন্নর রায় (১৯৫৩), সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪), আফসার আমেদ (১৯৫৯) প্রমুখের নাম করা যায়। তথাকথিত বাণিজ্যিক জনপ্রিয়তার লক্ষণহীন সাহিত্যে নিয়ত ভাঙাগড়ার পক্ষপাতি এই লেখকদের অধিকাংশই জীবন ও জীবিকা অভিজ্ঞতাসূত্রে নির্বাচন করেছেন এক একটি অঞ্চল। নলিনী বেরা এদেরই সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক। অন্ত্যজ মানুষকে কেন্দ্রে সংস্থাপন করে যে নিম্নবর্গীয় জীবন চিত্রিত করেন নলিনী বেরা সে জীবন কিন্তু শুধুই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়; বরং বলা যায় সে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য সহযোগে স্বতন্ত্ররূপে ভাস্বর। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন–

> যে জনগোষ্ঠী যত প্রান্তিক, যত স্বতন্ত্র, তথাকথিত সভ্যতা থেকে যত দূরবর্তী, তার গোষ্ঠীচৈতন্য তত প্রবল। ... নিম্নবর্গ মানুষের বঞ্চনার, রিক্ততার, শোষণের বাস্তবতা কখনোই অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতনের মান দিয়েই শুধু সেই শোষিত বঞ্চিত মানুষগুলোর সম্যক পরিচয় নেওয়া যায় না। তার দেশ, তার বৃত্তিও তার আংশিক পরিচয় মাত্র। সীমাহীন নিঃস্বতার মধ্যেও তাদের কিছু কিছু নিজস্বতা আছে, যে নিজস্বতা তাদের অস্তিত্বের মর্মমূল পর্যন্ত জড়িয়ে থাকে। তাদের মিথ, লোক-ইতিহাস, সংস্কার, আচার-রীতি, এই সবই তাদের গোষ্ঠীজীবনের কয়েকটি নির্ধারক। (২০০৯, ১২-১৩)

নলিনী বেরার গল্পেও দেখি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রান্তীয় জীবনজিজ্ঞাসার বিচিত্র রূপায়ণ ঘটেছে, যা বাঙালি পাঠক মনে এক ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। মিডিয়ার জৌলুসের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা পল্লী বাংলার শাশ্বত অন্তরাত্মা আর তার লোকায়তনিক বৈভবকে নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেন তিনি তাঁর গল্পের আধারে। ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোতে তথাকথিত নিম্নবর্গের সঙ্গে সহাবস্থানে নির্ণিত হয় তাঁর গল্পের চরিত্ররা। উচ্চবর্গের কাছে অপ্রধান জনগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতা তার আদিম জৈবপ্রবৃত্তি, নর-নারী সম্পর্কে প্রচলিত নীতিশাসন বহির্ভূত আচরণ, উচ্চবর্গ কর্তৃক শোষণ-শাসন, সংস্কার ও স্বতন্ত্র জীবনযাপনের রীতিপদ্ধতি নিয়ে সম্যকভাবে উন্মোচিত হয় নলিনী বেরার ছোটগল্পে। পুরুষানুক্রমিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার শিকার যে অরণ্যচারী আদিবাসী জনজাতি; যাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য তাদের নিয়েও লিখেন নলিনী বেরা।

নলিনী বেরাকে শৈশব থেকেই পাঠ্যভাষা থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলা চলিত ভাষা শিখতে হয়েছিল। কুম্ভকার (কুম্হার) সম্প্রদায়ের বালককে শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার বিরুদ্ধেই লড়তে হয়নি, জীবন সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ভাষাগত প্রান্তিকতা নিয়েও। সামাজিক বা ভাষাগত সংঘাত অবশ্য তখনও শুরু হয়নি কারণ আঞ্চলিকভাবে জনঘনত্বে এবং ভাষায় হাটুয়াদের আধিক্য ছিল। 'কিশোর নলিনীর আত্মসম্মানে প্রথম আঘাত লাগে সেদিন, যেদিন তাঁর এক তথাকথিত উচ্চবর্গের বাড়িতে খাওয়ার পর প্রাণ প্রিয় বন্ধুর মা তাঁকে এঁটো থালাটি ধুইয়ে রাখতে বলে।' (সসীমকুমার বাড়ৈ ২০২১ : https://pagefournews.com)। দুঃখ যন্ত্রণা এবং অভিমানের ক্ষত কিশোর নলিনীর আত্মবিক্ষণের পথ খুলে দেয়। বাস্তবতার মুখোমুখি হন নলিনী, এবং অনুভবের যাত্রায় ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোতে তথাকথিত নিম্নবর্গের সঙ্গে নিজের সাযুজ্য নির্ণয় করে ফেলেন। অভিঘাতই তাঁকে চিনতে সাহায্য করে শূদ্র সমাজের প্রতি তথাকথিত ভদ্রলোকদের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বেছে নেন যাপিত জীবন ।

ভারতে ভূমিপুত্ররা আসলে সনাতন ধর্মের মধ্যেই বর্ণবাদী অত্যাচার অবহেলায় জর্জরিত। ধর্মীয় গঠনতন্ত্রে অবাঞ্ছিত নিম্নস্তরীয়। তাদের সমস্যা পুরাণ আরোপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক। তারা

নিজভূমেই পরবাসী। পেশা জাতভিত্তিক। ভারতীয় শ্রম ব্যবস্থায় আছে জাতপাতের মুখ্য ভূমিকা। এখানে বর্ণব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে শোষণ শাসন জিয়ে রাখা হয়েছে। (ড. সাঈদ-উর রহমান ২০১৩ : ১৭)। বিশেষত 'অন্ত্যজ জাতিগুলি, যারা আদিম প্রযুক্তিবিদ্যাসম্পন্ন তারা সাধারণত, দরিদ্রতম এবং হিন্দুসমাজে তারাই সংস্কৃতিগতভাবে সবচেয়ে অনগ্রসর অংশ।' (হিতেশরঞ্জন সান্যাল ১৯৯৮ : ২৮)। নলিনী বেরার স্কুল 'রোহিণী চৌধুরাণী রুক্মিণী দেবী হাই স্কুল'-এর হোস্টেলের ছাত্রদের নামের তালিকা যদি লক্ষ করা যায়, সেখানে দেখব ভীড় করে টুডু সিং, হেমব্রম, হাঁসদা, মুর্মু, বাউরি, সোরেন, বিশুই, মুন্নডা, বেরা, রাণা, হাটুই, ভুঁইঞা, পানি, বেহেরা, মাঝি, পৈড়া'র মতো অবহেলিত জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পদবিসমূহ। লক্ষণীয় যে, পদবিগুলো মউলত তপশিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণিভুক্ত এবং সাম্প্রতিক শিক্ষাঙ্গনে এসেছে তাদের প্রথম প্রজন্মের সন্তানরা, যারা ভারতীয় সমাজে শাস্ত্রে এবং শিক্ষায় ব্রাত্যজন ছিল বৈদিক অনুশাসনে। এই অবজ্ঞাত অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি বুনেছেন তাঁর শিল্পকর্ম। তবে এ অঞ্চল বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবমুক্ত নয়। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাওয়ার পথে এই অঞ্চলে শুনিয়েছেন, হরিনামে চন্ডালও ব্রাহ্মণ হতে পারে। নলিনী বেরা সেই আঞ্চলিক অনার্য সমাজের প্রথম প্রজন্মের মেধাবী সন্তান। যার গল্প প্রমাণ করে, 'সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়, মেধা এবং লড়াইয়ে সুচারুভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিকল্প স্বরে কথাই হবে সাহিত্যে প্রতিবাদের ভাষা। ইতিহাস বেদ পুরাণ কোরান বিনির্মাণে নতুন ব্যখ্যা আনতে হবে।' (সসীমকুমার বাড়ৈ ২০২১ : https://pagefournews.com)। নলিনী বেরা নীরবে সেই বিনির্মাণ করে চলেছেন সাহিত্য কর্মে। তিনি সরাসরি দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অনুসারী নন, তিনি প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার কথা সমাজের মূলধারাকেই শোনাতে চান এবং এর প্রতিকার চান।

একটা নির্দিষ্ট এলাকার লোকায়ত যাপনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায় নলিনী বেরার গল্পে। যে অঞ্চলে তিনি জন্মেছেন সেই অঞ্চলটি পুরাভূমির অন্তর্গত ছিলো। সেই অঞ্চলই তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমি। আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির আকর যে লোকভাষা, লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, লোকবিশ্বাস, লোকগান তা আয়ত্তে থাকায় নলিনী বেরার সাহিত্য চর্চার উপাদান হয়ে উঠতে থাকে চেনা মানুষজন, যারা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে তাঁর লেখায়। যাপন চরিত্র নিয়েই সৃষ্টি হয় তাঁর *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা*, *মাটির মৃদঙ্গ* বা *শবর চরিত*-র মতো উপন্যাস এবং ছোটগল্প। তবে পর্যবেক্ষণের নিত্যনতুন প্রয়াস তাঁর থাকে।

আমাদের প্রমিত বাংলাভাষা যেমন লেখকের করায়ত্ত, তেমন বা তার থেকেও বেশি দক্ষতা তাঁর ভূমিজ ভাষার ওপরে (যে ভাষা আধা বাংলা আধা উড়িয়া, এককথায় সব হাটুয়া লোকজনের কথ্য ভাষা)। আর এই যুগপৎ কর্তৃত্বই অসাধারণত্ব এনে দিয়েছে নলিনী বেরার গল্পকে। সমালোচকের কথায়–

> শ্রীবেরার ভাষার ওপর সাবলীল ও সহজাত দক্ষতা রয়েছে। ভূমিজ বা আদিবাসী জনজাতির ব্যবহৃত ভাষা যেমন অবলীলাক্রমে তিনি ব্যবহার করেছেন, তেমনি শুদ্ধ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দকেও সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বসিয়েছেন আপণ অভিরুচি অনুসারে। (শান্তনু চক্রবর্তী ২০১৯ : https://parabaas.com)

আসলে সুবর্ণরেখা নদীপারের ভাষা এক মিশ্র ভাষা। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার কারণে ওই অঞ্চলের বাংলাটা পাঠকের কাছে মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু নলিনী বেরা জানেন এই ভাষা ছাড়া এই অঞ্চলের সাহিত্য অসম্পূর্ণ। তিনি যেহেতু তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে বহন করেন, তাই এই ভাষার ব্যবহার তার অধিকার। 'ভূতজ্যোৎস্না',' কুসুমতলা', 'ধানফুলি মাছ', 'যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের', 'চমকাই টাঁড়ের পিচ রাস্তা', 'ঘবা, তিহা-র গল্প', 'ছেঁড়া কুড়চির মালা', 'চিড়িতনের উল্কি', 'হাতিডহর', 'বোরজ', 'নুয়াসাহীর বটতলা' ইত্যাদি গল্পে একটা বিশেষ ভৌগোলিক

অঞ্চলের মানুষজন, তার ভাষা ও সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে পাঠক খুঁজে পায় অন্য ও অনন্য এক বাংলা সাহিত্যজগতকে। অনাগরিক পৌর সমাজবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রান্তিক ব্রাত্যজীবনচিত্র নির্মাণের নিরন্তর তাড়না মাটির সনাতনী গন্ধ নিয়ে নলিনী বেরার ছোটগল্পের প্রাণবীজ হয়ে ওঠে। শিলাবতী, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, টটক-কুমারী, রাঢ়-কাঁকর, ডুলুং, সুবর্ণরেখা নদীবিধৌত ঝাড়খণ্ডের আসনবনি, কুড়চিবনি, জামবনি, শালবনি, কেঁদবনি, বনকাটি, মুড়াকাটি, আমডিহা, বাঘমারি, ভালুকঘরা, ল্যাকড়াগুড়ি, বাঘুয়াশোল, টিকরপাড়া, রণজিৎপুর, লবকেশপুর, হাতিবাঁধা, গোপীবল্লভপুর, রোহিণী, কুলটিকরি ইত্যাদি গ্রামনামের অনুষঙ্গে তৈরি হয়েছে নলিনীর গল্পের জমি। এই ভৌগোলিক অঞ্চলকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয় এই এলাকার গাছ-গাছালিও। হিঙচা, হিড়িমিচা, ঘলঘসি, আঁটারি, চরচু, ডকা, কুচলা, আসনশাল, পিয়াশাল, কেঁদ্‌করম, ভাদু, ভুড়রু, করণ, কইম, বাদাম বাদভেলা, কদম, গাবগুলি, গুটিমন, দধিয়া, কুড়চি, গোনালি, জাড়া, জারুল, চাঁড়াশ, পাকুড়, কষাফল ইত্যাদির আধিক্য চোখে পড়ে এই অঞ্চলে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত বদলে গিয়েছে বাংলার গ্রামগুলি। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার পৌঁছে গিয়েছে গ্রামগুলিতেও। গ্রাম বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐশ্বর্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে আধুনিকতার আগ্রাসন। কিন্তু অন্ত্যজ শ্রেণির সার্বিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে না। কেন্দ্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কখনো ব্যবহৃত হচ্ছে, কখনো কেন্দ্রীয় আধিপত্যের শিকার হচ্ছে। নলিনী বেরাকে তাই দেখা যায় দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ করে বড় হয়ে ওঠার পথের দুধার থেকে সংগ্রহ করছেন তাঁর লেখার রসদ। এই মানুষদের কথা বলতে গিয়ে নলিনী বেরা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন-

> সেখানে মানুষ ভূত পোষে। আর সে ভূত বাঁদরের মতো ঘাড়ে মাথায় করে রাস্তাঘাটে ঘুরেও বেড়ায়। পোষাভূত অন্যের খামার থেকে ধান চুরি করে এনে ভূতের মালিককে বড়োলোক বানায়। ধরা পড়লে আবার সভাস্থ পাঁচগ্রামের দশজন বিচারকের সামনে গ্রামফান্ডে জরিমানাও দেয়। এখানে অভাবী কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাপ গলবস্ত্র হয়ে, নদীর দহের দিকে চেয়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানস্থ বসে থাকে, দহের ভূত কখন হুস করে নদীজলে ভেসে উঠবে তার মেয়ের যৌতুকের দানসামগ্রী হাতে নিয়ে। এখানকার কামারপাড়ায়, কামারশালে, গভীর রাতে হাতুড়ির ঠুকঠুক আওয়াজ করে জলাশয়ের ভূতের জন্য ঝিঁজরি গড়ে দেয় কামারের কামার রাজাকামার, যে-ঝিঁজরি বা শেকল মানুষের পায়ের আঙুলে শ্যাওলার মতো জড়িয়ে জলাশয়ের ভূত অমোঘ টান দেয়। (বিশ্বজিৎ পাণ্ডা ২০২২ : https://www.jaladarchi.com) ।

পশ্চিমবঙ্গে শবর একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। তারা মূলত ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলায় থাকে। নলিনী বেরার গল্পে যেমন নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার বড় বড় শবর জনবসতির বিবরণ আছে, তেমনি আছে লোধাদের কথা। লোধারা কোথায়ও নিজেদের লোধা-শবর হিসেবে পরিচয় দেয়, কোথায়ও খেড়িয়া-শবর। আদমশুমারি অনুসারের লোধা এবং শবরদের আলাদা পরিসংখ্যান আছে। শবর হিসেবে চিহ্নিত জনসংখ্যা মোট আদিবাসী জনসংখ্যার এক শতাংশের মতন। এই শবর কিংবা লোধাদের পরিচয় এবং পরিসংখ্যানে লুকিয়ে থাকে গভীর গন্ডোগোল। '১৮৭১ সালের ব্রিটিশ গেজেটিয়ারে এই উপজাতিকে 'অপরাধ প্রবণ' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।' (ক্ষিতিমোহন সেন ১৯৯৭ : ৬৬)। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভোটমূল্যের কারণে রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুটা বাড়লেও সংখ্যালঘু এই উপজাতির সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসে না। নলিনী বেরার গল্পে রয়েছে তারও পরিচয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আরোপিত কলঙ্কের দাগ লোধা-শবরদের গায়ে বর্তমানেও সমানভাবে বহমান। পাহাড় প্রমাণ অর্থনৈতিক বঞ্চনা পেরিয়ে লোধা সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে চুনি কোটালদের এখনও জীবন বিসর্জন দিতে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষক শিক্ষিকাদের তাচ্ছিল্য-অবজ্ঞার কাছে। কমিশনের বিচারপতি মৃত্যুর ঘটনাকে নগণ্য/ তুচ্ছ (Trivial) ঘটনা বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। আদিবাসী ডাক্তার পায়েল তাদভি বা গবেষক রোহিত ভেমুলার মতো মেধাবী দলিতদের আত্মহত্যা চলতেই থাকে বর্ণবাদী অত্যাচারে। গল্পকার নলিনী বেরা কিন্তু দায়বদ্ধ থাকেন সেই শবর-লোধা সমাজের কাছে। তিনি চুনি কোটালের আদলে নির্মাণ করেন লক্ষ্মীরানি মল্লিককে। পরোক্ষে নির্মাণ হয়ে যায় প্রতিবাদের ভাষা। আর কঠোর পরিশ্রমে শবর-লোধাদের সীমাহীন জীবন যন্ত্রণা নিয়ে লিখে ফেলেন মহাকাব্য সাদৃশ উপন্যাস *শবর চরিত*। বাংলা সাহিত্য তার গতানুগতিক অন্তঃসারশূন্য জড়তা ছেড়ে সন্ধান পায় এক অপার বিস্ময়কর জগতের। অফুরন্ত শব্দভাণ্ডার কেঁদ, মহুয়া, কাকঁর, ভুড়রু, সুদখোরী বা পদ্মল ঘা, কুঁইরানো, গাড়িয়া, বুড়ে যাওয়া, মাগনে, কচিকুসুম, বাহা ঘর, দেড়ইয়া, মেঘপাতাল-এর মতো শব্দ যোগ হয় বাংলা সাহিত্যে। কলকাতা থেকে সামান্য দূরের এই শব্দ বিশ্বের কথা আমাদের অজানা। এ যেন এক বহুত্বের জানালা খুলে দিলেন নলিনী বেরা।

নলিনী বেরা'র গল্প নিয়ে পুনরাবৃত্তির নেতিবাচক সমালোচনা শোনা যায়। বস্তুত এই সমালোচনার খুব বেশি যৌক্তিকতা নেই। কারণ নলিনী বেরা এমন এক অপাঙক্তেয় সমাজের চর্চা করেন যা প্রথাগত নাগরিক সমাজ জানেই না, চেনেও না। এই নরগোষ্ঠীর ভাষা নাগরিক সমাজকে চেনাতে হলে কিছু কথা, শব্দ বা ঘটনার পুনঃপুনঃ ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। একটু গভীর ভাবে দেখলে দেখা যাবে এই অনার্য সমাজের দুঃখ যন্ত্রণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য সুরের মতো বিরামহীন এবং চলমান। তাকে এক একটি ঘটনায় বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সেখানে ভারতবর্ষ স্থবির। স্বাভাবিকভাবেই তাকে ভাঙতে হলে পুনঃপুনঃ চর্চা দরকার। সেই পথচলায় গল্পকার নলিনী বেরা যেন আচ্ছন্ন সব শবর, লোধা, মুন্ডা, মাঝি, সাঁওতাল, বাগদি, জেলে, কুমোর, নায়েকদের বিপন্নতার সঙ্গে। কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা এবং সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-পরিবেশ নিয়ে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> বাংলাকে বলা হতো পাণ্ডব বর্জিত দেশ, বস্তুত এখন পশ্চিমবঙ্গ তার উল্টোটা। ব্রাহ্মণ্যবাদের সর্বব্যাপি আধিপত্যে ভূমিপুত্র অনার্যরাই এখানে অপাঙক্তেয়। নাগরিক শিল্প সাহিত্যে তথাকথিত কৌলিন্যের একচেটিয়া মনোপলি। লোকসংস্কৃতিকে এখনো কিছুটা নিম্নবর্গের কালচার করে রাখা হয়েছে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে নলিনী ২০০৮ সালে *শবর চরিত*-এর জন্য বঙ্কিম পুরস্কার পান। সরকারি স্বীকৃতি। ২০১৯ সালে আনন্দ পুরস্কার পান *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা* উপন্যাসের জন্য। এটা অনিস্বীকার্য যে তাঁর মতো এক প্রান্তিকের পুরস্কার প্রাপ্তি একটি বড় ঘটনা। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ এতদিন ভাবতেই পারত না যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বাদে বঙ্গে কারও মননশীলতা আছে বা নলিনী বেরার মতো অপাঙক্তেয় পদবিধারীরা সাহিত্য রচনা করতে পারে। নলিনী বেরার উত্তরণ সেই আধিপত্যবাদী বৃত্তের প্রথম ভাঙন। এখন হয়তো বলার সময় এসেছে, গণসাহিত্যের যে মৌলিক উপাদান, শক্তি এবং প্রাণরস দরকার তা কেবলমাত্র নলিনীদের মতো প্রান্তিকতা নিয়ে কাজ করা সাহিত্যিকদের কলমেই আছে। (সসীমকুমার বাড়ৈ ২০২১ : https://pagefournews.com)

আসলে প্রকৃতির চেয়ে বড় শিল্পী সাহিত্যিক আর কেউ নেই। তার সত্তাই শিল্প সত্তা, সৃষ্টিই তার শিল্প। তাকে নতুন করে শিখতে হয় না শিল্পের নির্মাণ বিনির্মাণ ভাবনা। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন মূলত প্রকৃতি পূজারী। তাদের গোত্র বা টোটেম হল- বৃক্ষ, পশু, পাখি, নদী-নালা, মাছ-কচ্ছপ। তাদের জীবন জড়িয়ে থাকে দেশজ/ভূমিজ উপাদানে। এই লোকায়ত বিশ্বের কোনো সীমা নেই। চৌহদ্দি নেই। দেশ-কাল নেই। তারা নিজেরা এক সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গ এবং সেবায়েত। যা নলিনী বেরা নিজেও বহন

করেন তাঁর আপন সত্তায়। তাই নলিনী স্বীকার করে নেন তাঁর 'মায়ের নাম শালফুল বাপের নাম শালপাতা বেরা'। (২০১৫ : ৩৭৩)। ফলে তাঁর সাহিত্য সম্ভার হয়ে যায় সুফি-বাউল গানের সহজিয়া কথকি ধারার ন্যায়। তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে আপাতভাবে পটভূমি-প্রেক্ষাপটের একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও প্রতিটি রচনাই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয় পাঠকের বোধে চেতনায়। আসলে লেখকের অবলোকন ভঙ্গিটাই নিরন্তর বদলে যায়। তবে প্রতিটি গল্পেই প্রাধান্য পায় মাটির কাছাকাছি একজন লেখকের আখ্যান।

নলিনী বেরার *সেরা পঞ্চাশটি গল্প* (২০১৫) গ্রন্থের মধ্যে পরিব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক পঞ্চাশটি গল্প। অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রাম। সুনির্দিষ্ট করে বললে সেই গ্রাম আবার গল্পকারের চিরচেনা নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত বাছুরখোঁয়ার গ্রাম ও সুবর্ণরেখা নদী সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চল। গল্পগুলো আবর্তিত হয়েছে যে চরিত্রগুলোকে ঘিরে তারা কেউ অভিজাতবর্গের নয়। বরং একান্নবর্তী কৃষক পরিবারে বড় হতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন লেখক, সেখানে জীবন যেমনভাবে এসেছে সামনে, তেমনিভাবেই চরিত্র ও ঘটনাকে উপস্থাপন করেছেন। তাই তাঁর গল্পের নির্মিতি এতটা সহজ-সরল। গ্রন্থটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য–

> নলিনী বেরার প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' অবশ্যই জ্ঞাতব্য। বিচিত্র জীবনসত্য গ্রন্থখানিতে প্রাধান্য পেয়েছে। পারিবারিক পটভূমিসহ জন্মভূমির স্মৃতি, স্বজন-প্রিয়জনসহ স্বভূমির মানুষের জীবনযুদ্ধ, নিম্নবিত্ত-নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযুদ্ধ, লোকায়ত পরিসর, বিশ্বাস-সংস্কারের দোলা, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামসহ মাওবাদী আক্রমণ, জীবনের সাত-সতেরো নানাভাবে ফুটে উঠেছে। স্বভূমির গোটা সমাজকেই চিহ্নিত করা যায় গ্রন্থখানির মধ্য দিয়ে। অসাধারণ সব গল্প। জীবনকে এমন ফ্রেমে রেখে, দরিদ্রের সত্য সুরেলা তারে এমনভাবে তিনি বাজিয়েছেন যা পাঠককে মুগ্ধ করে। (সুনীতি সরকার ২০২৩ : https://www.tirj.org.in)

নলিনী বেরার গল্পের মধ্যে তেমনভাবে থাকে না প্রধান নায়কোচিত কোনো চরিত্র অথবা আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত কোনো কাহিনি। যেমন- 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পটিতে ভূমিজ চরিত্র দিবাকর সিং। সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে কৌশলে শূন্য থেকে সাপ নামায়। ঝাঁপানের জল তুলতে গিয়ে সাপ তোলে। সেই সাপ ঘাড়ে নিয়ে নাচায়। লোকে বলে এটা মন্ত্রশক্তি। গ্রামে যে খোঁয়ার আছে তার পাহারাদারও সে। অনাহারের সংসারে উপরি পাওনার আশায় এক-আধটা গরু-ছাগলের বাচ্চা বিক্রিও করে দেয়। কিন্তু গৃহস্থেরা তাকে চোর অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠায়। ক্ষমতাবানের কাছে দুর্বল দিবাকর এক সময় দাগী চোর সাব্যস্ত হয়। কিন্তু নিছক দিবাকরের গল্পে এই আখ্যান সমাপ্ত হয় না। গল্পটি ব্যঞ্জনাপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন ৬৪-অতিক্রান্ত এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক উমাকান্ত সিং ও তার বি.এ. পাস মেয়ে রঞ্জনার গল্পটি সংযুক্ত হয়। আসলে যুক্ত হয় না, উমাকান্তই দিবাকরের গল্প লিখে মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে 'শতাব্দীমঙ্গল' নামে। কারণ রঞ্জনা চায় তার বাবা এমন একটা চরিত্র অঙ্কন করুক যার মধ্যে এই শতকের যাবতীয় গুণাবলী রয়েছে। কাজটি খুব কঠিন, কিন্তু সে চেষ্টা করে। তার লেখার প্রথম পাঠক তার মেয়ে। মেয়ের মন্তব্যে কাহিনিতে কিছু কাঁটছাটও করে উমাকান্ত। কিন্তু প্রায়ই একটা মোটরবাইকের ভটভট আওয়াজ তার লেখায় বিঘ্ন ঘটায়। কারণ শব্দটা এলেই রঞ্জনা দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে যায়। শেষে রঞ্জনা একেবারেই চলে যায়। কোথায় যায় বা তার সাথে কী ঘটে তা আর স্পষ্ট করেন না গল্পকার। কিন্তু প্রতিবেশী শশধর রাউতের ছাদের লাউলতা মরে যাওয়া এবং 'হেথা নয় হোথা নয়, উর্ণনাভ আর কোথাও বয়ন করবে তার তন্তুজাল' এমন উক্তিতে রঞ্জনার সাথে ভালো কিছু যে ঘটেনি তা বোঝা যায়। আর তখনই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যগুলি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়–

> 'নীলোৎপল সরোবর। তাহে ডুবিল দিবাকর'ও আর দুর্বোধ্য থাকে না। বিগত শতাব্দীর গুণরাজি সমন্বিত, দিবাকর নামের আড়ালে তাঁর নিজেরই বাবাকে নিয়ে লেখা 'শতাব্দীমঙ্গল'-এর পাতাগুলিও ধীরে ধীরে খুলে যায়।
> আসলে এসবই ঘটে যাচ্ছে 'আসছি' বলে ওই যে যাওয়া, আর ফিরে না-আসার পর থেকে। এখন দূরে, কাছে পিঠে, কোথাও মোটরবাইকের আওয়াজ শুনলেই কেঁপে কেঁপে উঠছেন উমাকান্ত।
> স্ত্রী অনুভা চোখ পাকিয়ে বিড় বিড় করে অনর্গল বলে যাচ্ছেন–'যে ঘোড়ায় চড়ে লোকটা রঞ্জনাকে নিয়ে পালিয়েছে সে ঘোড়ার ল্যাজে আমি সর্ষের দানা বেঁধে দিয়েছি গো। ঘোড়া যত ছোটাবে সর্ষের দানাও তত ঝরে পড়বে ঝুর ঝুর। দানা পড়ে গাছ হবে। আর সেই গাছ দেখে দেখে পথ চিনে রঞ্জনাকে উদ্ধার করতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না গো, দেখো!' (নলিনী বেরা ২০১৫ : ৯৩-৯৪)

সাধারণ মানুষের গতানুগতিক জীবনের পাশে এই গল্প যেন সমাজের গভীরতর কোনো অসঙ্গতির ইঙ্গিতবাহী। জীবনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কোনো বেদনার ক্ষীণরেখা। তবে এখানেও লেখক প্রান্তেবাসী জনগণের বিশ্বাস, সংস্কার আর মিথের সাবলীল ব্যবহার করেছেন।

বাস্তবতা আর অলৌকিকতার মিশ্রণে নির্মিত নলিনী বেরার গল্পগুলো পাঠককে এমন এক অপরিচিত মায়াময় জগতের সংকেতময়তার দিকে নিয়ে যায় যে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে যায়। কিন্তু গল্প শেষে আলোর সন্ধান মেলে। এমনই এক গল্প 'ভূতজ্যোৎস্না'। নলিনী বেরার আখ্যানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর ভিতর বহু লেখকের বহু উদ্ধৃতি, পুরাণ, লোকায়ত পুরাণ, ছড়া, ধাঁধাকে সামনে রেখে আখ্যানকে গতি দান করা। 'ভূতজ্যোৎস্না' গল্পের প্রারম্ভে 'সদুক্তি কর্ণামৃত' থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক তা সমৃদ্ধির চিত্রে পূর্ণ। কিন্তু গল্পের পরবর্তী অংশে যে বাস্তবতার সন্ধান মেলে তা পুরাণের বিপরীত মেরু নির্দেশ করে। গল্পের চরিত্র হিসেবে উপস্থিত কংসহরি ঢালী ও সরিন্দর দলুই সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য-

> দু-জনেরই দেহ আলকাতরা। কারোরই পরনে কাপড় নেই বললেই চলে, আড়াই হাতেরও কম খেটো গামছায় লেংটির মত করে কোনোমতে কোমরটা জড়ানো। ... সজনে-ডাটার মতো কংসহরির হাতে-পায়ের শিরা-উপশিরা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এমন জট পাকিয়ে গিয়েছে যে লোকে তাকে সজনে-খাড়া বলেই ডাকে। ... দু-জনেই অতিশয় গোমুখ্যু, কারো পেটেই কালিগোলা জল নেই ছিটেফোঁটা। ... খেতে না পেয়ে দু-জনেরই পেটে খোঁদল হয়ে গিয়েছিল এক বিঘৎ। (নলিনী বেরা ২০১৫ : ১১-১২)

গল্পে ডোম চরিত্র সৃষ্টিধর আগুয়ান, গরুবাগাল অনন্ত, কৈলাস, নাকো হাড়ির বৌ- প্রত্যেকেই অন্ত্যজ শ্রেণির। শশ্মানে দাহ হওয়ার পর আধপোড়া মরা কাঠই লোকেরা নিয়ে যায়- এমন দারিদ্র্য তাদের। কিছু শিক্ষিত চরিত্রও আছে। তবে গল্পের বিস্ময়কর দিক হচ্ছে এই অন্ত্যজ শ্রেণির জ্ঞানের গভীরতা। দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ সরিন্দর যখন শোনায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি'র কিস্‌সা–'চৌরাশি দিন বিফলে গেলা, যাউক না, পঁচাশি দিনের দিন ঠিক মাছ পড়বে', কিংবা কংসহরি বলে চার্বাক দর্শনের কথা-'জীবন মানে যুঝি যাও টিকি থাকো। যেন জাতানি জীবন্তি', অথবা সরিন্দরের মুখে কামুর 'মিথ অফ সিসিফাস', কংসহরির কথায় জা পল সার্ত্র–'আওয়ার লাইফ হ্যাজ নো ফিউচার, ইট ইজ এ সিরিজ অব প্রেজেন্ট মোমেন্টস'–তখন তা প্রতীকি ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এটি আরও তীব্ররূপ ধারণ করে যখন স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার ডাবল এম.এ অমূল্যধন দে, পি. কে. দে. সরকারের বই থেকে সৃষ্টিধরকে অনুবাদ করে দিতে বলে আর জিজ্ঞেস করে- গফুর জোলার পরে 'ইজ' হবে না কি 'আর' হবে। গল্পকার যেন তীব্র তীক্ষ্ণবাণে আঘাত করতে চান শিক্ষিত

পাঠকবর্গকে। কেননা গফুর জোলা একা হতে পারে না, সে একা নয়, স্বাধীন ভারতবর্ষেও অধিকাংশ মানুষই গফুর জোলার মত হতদরিদ্র, সঙ্গীন। এভাবে গল্পে কখনো নেরুদা, ভ্যানগঘ, পল গঁগ্যা, কখনো বাখতিন, কখনো কিয়ের্কেগার্দ উপস্থিত হয় আর সম্ভব-অসম্ভবের দোলাচলতায় জাদুবাস্তবতার পরিবেশ তৈরি করে। গল্পটি শেষ হয় সরিন্দর আর কংসহরির চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে একে অপরের অস্তিত্ত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া ও লুকোচুরি খেলার মধ্য দিয়ে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চরম অনিরাপত্তার মধ্যে বেঁচে থাকার সংশয়চিত্র প্রকাশ পেয়েছে নলিনী বেরার 'মহাপ্রস্থানের পথে অথবা ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পে। কোন এক রাজনৈতিক সংকটে দরিদ্র নীলুয়াদের ভাঙা কুঁড়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয় অজানার উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তারা মহুল আর ছাল ছাড়ানো তেঁতুলের বিচি, পিঁপড়ের ডিম বা কুরকুট পটম, চোখ না ফোটা কাঁড়াল-কোঁড়ল চুটিয়ার বাচ্চা, শালুই পোকা- এসব সংগ্রহ করে। বনের পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে জেগে দেখে নীলুয়ার বোন নাকফুঁড়ি নেই। কোথায় আছে তারা জানে না। এর কিছুক্ষণ পরেই পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আচমকা মৃত্যু ঘটে নীলুয়ার বাবার। মাও মুখে ফেনা তুলে অজ্ঞান। ঘর ছেড়েছিলো চারজন। এখন নীলুয়া একা অসহায় হয়ে যায়। এমন বিপর্যয় ছিন্নমূল মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে।

প্রচলিত ভূতের গল্পের থেকে নলিনীর ভূত-বিষয়ক গল্পগুলি আলাদা। কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এভাবে না দেখে ভূত-সম্পর্কিত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারকে আঘাত না করেই গল্প বলেন তিনি। ফ্যানটাসিও বলা যায় না ঠিক। নলিনীর গল্পের ভূতেরাও জগৎ সংসারের একটি প্রাণী বিশেষ। মানুষের সঙ্গেই তাদের সহবাস। যে আঞ্চলিক পটভূমিকায় তাঁর গল্পগুলি লেখা সেই অঞ্চলের ভূগোল ইতিহাস সবই তো অদ্ভুতুড়ে। মানুষগুলোও। লেখক নিজেও সেই অদ্ভুতুড়ে আবহে সম্পৃক্ত। ২০০৭ সালে 'প্রিয়ংবদা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে নলিনী বেরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> সেখানকার নদনদী পাহাড়-টিলা বন ডুংরি বট অশ্বত্থ-ধ-আসন-চুল্লা-চুরচু-শাল-পিয়াশাল গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে, হাঁটে। এমনকি, ভুদু-মহুল-কুচলা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ গাছে যে সমস্ত ভূত থাকে, সেই সমস্ত ভূতেরাও কতদিন বাঁশের কলম, চাঁছতে সাহায্য করেছে। উপদেশ দিয়েছে, এই কর, সেই কর, তবেই কলমের ডগাল খুব ছুঁচালো হবে। তারা আমার সঙ্গে 'দাঁড়িয়া' 'বাঘবন্দী' 'হাতুতু' 'কিতকিত' 'কাতি' কতরকম খেলা খেলেছে। খেলতে খেলতে হাত-পা কেটে গেল টিপ্পার আয়োডিন ডেটল না হোক তাদের ক্ষতস্থানে গাঁদা চাকুদার রস তো লাগিয়ে দিয়েছি। প্রচণ্ড খুশি হয়ে তারা আমাকে বরদান করেছে। আর সেই করে আমি এখনো মাঝে মাঝেই দেখে ফেলি, মানুষগুলো স্থির, স্ট্যাচু। (বিশ্বজিৎ পাণ্ডা ২০২২ : https://www.jaladarchi.com)

তাঁর অনেক গল্পের প্রধান চরিত্র ভূত বা ডাইন। 'ভূত ভূত' ('শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, ২০০৩) গল্পে আছে ঝাঁপড়ীভূতের কথা। রাজারামের বিপুল ধনসম্পত্তির আসল কারণ যে ঝাঁপড়ীভূত তা রতিলের জানা। তাই তো বড়োলোক হওয়ার আশায় সেও একটা ঝাঁপড়ীভূত পুষতে চায়। কিন্তু পাবে কোথায়? মন্মথ-র দ্বারস্থ হয় রতিল। মন্মথ তাকে শোনায় ঝাঁপড়ীভূতের কীর্তি। ধানঝাড়ন শেষ হলে রাতে পাহারায় থাকে ঝাড়েশ্বর। সব মানুষের আঙিনায় যখন ধানের সমারোহ তখন কে চুরি করে জানবে সে। আচমকা যে সময় ঘুমে বিভোর ধরিত্রী, সে আসে- 'রুনু রুনু রুনুর ঝুনুর পায় সুন্দরী যে যায়! ঝাঁপড়ী ভূত আবার কে? পাছা ছেড়ে ধুলায় লুটোচ্ছে মাথার কেশ। এক হাত দেড় হাত উচ্চ শরীর। হাতে এই টুকুন এক দাঁড়িপাল্লা। টুরটুর- টুরটুরিয়ে এসে খপাৎ করে পাল্লাটি গুঁজে দেয় ধানগাদায়। কিছু ধান সরসর উঠে আসে- সে এক মজার কল।' (২০০৩ : ৫৬)। হতভম্ব ঝাড়েশ্বর

দ্যাখে, ভূত যত এগোয় ধানের গাদা তত কমে। কমতে কমতে এক জায়গায় ঠেকলে হুঁশ হয় তার। পিছু পিছু গিয়ে ভূতটাকে জাপটে ধরে। 'ই-রিঃ কী ঠান্ডা, কী ঠান্ডা শরীর! জাঁতাকলে পড়ে ঝাঁপড়ী তো করে চিঁচিঁ। যত করে ঝাড়েশ্বর তত পিষে ফেলতে চায় দুহাতে। আজ তুকে চিপটে মেরে ফেলবনি খালভরি –দে আমার ধান দে।' (২০০৩ : ৫৭)। রতিকান্ত মন্মথর পরামর্শে ভূত ধরতে যায় ধ'তলে। এক টিপ সিঁদুর, কয়েকটা আস্ত তুলসীপাতা আর কাতান নিয়ে। গাছটির গোড়া আগাপাশতলা ছেঁটে ফেলল প্রথমে। মাটিতে রাখল সাতটি তুলসী। সাতটি কাঁড়াল-কোঁড়ল পাতা। একে একে সাতটি পাতায় সাত ফোঁটা সিঁদুর গাছের গায়ে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে শুদ্ধ মনে ধ'তলের ভূতকে আসতে বলে। দূরে কাতান হাতে অপেক্ষায় থাকে সে। ভূত আর নামে না। অধৈর্য রতিল কাতানের চটা মারে গাছে।

পরে অবশ্য অন্য এক ভূত ধরতে চায় রতিকান্তকে। ততদিনে সে শহুরেবাবু। চাকরি পেয়েছে। গ্রামে এসেই পড়ে ভূতের সামনে। যার জন্য সারা শৈশব ছুটে মরেছে সর্বত্র, সেই হাজির সশরীরে। দুহাত বাড়িয়ে ছায়ামূর্তি বলে আমাকে রাখো। কি করবে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'যা বলবে তা-ই। শুতেও পারি তোমার সঙ্গে, পিছু পিছু যেতেও পারি। বল তো উঠব বসব তুমার কথায়। এক ঢোক গিলে রতিকান্ত বলল, 'আর?' নেচেকুঁদে আনন্দে ভূত-উত্তর দেয়, 'কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। ধনদৌলত। চাও কি রাতমধ্যে মহাজন বানিয়ে ছাড়ব তুমাকে। রাখো'।' ঘর্মাক্ত রতিকান্ত কথা বলে না। ভূতের তোষামোদী শুরু হয়- 'রাখো না। হাতের নোখী পায়ে ঠেলছ! যাচা ধন।' 'উহুঁ' '(২০০৩ : ৫৭)-বলেই রতিকান্ত পিছু হটল। হটে গিয়ে ত্রাসে-ভয়ে দৌড়ল। অশরীরীও দৌড়চ্ছে। সবেগে দৌড়চ্ছে রতিকান্ত। 'হাহা হিহি হাহা হিহি'- হাসতে হাসতে ভূত দু'হাত বাড়িয়ে রতিকান্তকে ধরতে চাইছে।

ধ'গাছের ভূতের আরও একটি ক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে এখানে। ধ'তলের ঝোপঝাড়ে কাগজের কুচো রেখে এলে সকালের মধ্যে তা নোট হয়ে যায়। দিদি মানকুর বিয়েতে টাকার দরকার। রতিকান্ত তাই ধ'তলের ঝোপঝাড়ে কাগজ রেখে ধ'গাছের ভূতকে বলে এসেছে, 'কাল সকালের মধ্যে একেকটা একশ' টাকার নোট করে দাও। এসে করকরে পাই যেন। দেখ ভুল না হয়-দেখ ভুল না হয়।' (২০০৩ : ৫৭)। এক নিঃশ্বাসে বলে পিছনে না তাকিয়ে দৌড়েছিল রতিকান্ত।

নলিনী বেরার 'ভূত-ভবিষ্যৎ' (শারদীয় গল্পগুচ্ছ, ২০০৮) গল্পটির কথাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এই গল্পের কুচলা গাছের ভূতের এরকম ক্ষমতা আছে। এখানে দেখা যায় গ্রামের ভূতকে শহরে আনা হয়েছে। গ্রামে-ঘরে ভূতেরা খেতে পায় না। শহরে এলে দুধটা ঘিটা পাবে। তাই শহরবাসী লেখকের অনুরোধে তাঁর গ্রামের দুই বন্ধু ভুজু আর ডিবরা পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম থানার বাছুরখোঁয়াড় গ্রাম থেকে মাটির হাঁড়িতে ভূতের চারা এনেছে। হাঁড়ির মুখ শালপাতায় মুড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। দিনক্ষণ না দেখে ভূতগুলোকে ঘরে তুলল না ভুজু-ডিবরা। রক্তকরবীগাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল দুটো হাঁড়িকে। একবার মোড়ক খুলে দু-ঘটি জল আর দু-মুঠো মাটি ঢেলে দিল। এতেই সপ্তাহখানেক নিশ্চিন্ত। ঠিক দুদিন পর মাটির হাঁড়ি থেকে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে আসবে ভূতগুলো। সাতদিন পর থেকে ওজন বাড়বে। সুষম খাদ্য তালিকাও প্রস্তুত করে দিল ভুজু-ডিবরা। ভুজু ডিবরা গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় লেখককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেছে 'গাঁইয়া ভূত' বলে তাদের যেন অনাদর না করেন। সর্বদা সন্তান স্নেহে 'মানুষ' করেন। সত্যিকারের কোনো দোষ করলে আচ্ছা করে কানমলা দিয়ে শাস্তি দিতেও যেন না ভুলে যান তিনি।

এখানে মানুষের শৈশব আর ভূতের শৈশব যেন একাকার। লেখক তার পোষা ভূতদের নামকরণও করেছেন, গোল্লু, কাল্লু, ঝাঁপড়ি, কুচুল্লা। সবটাই বিপণন যোগ্য হয়েছে। সন্ধান পেয়ে নাসার লোকজন গোল্লুকে নিয়ে গেল। গোল্লু যাবে মঙ্গলে। ভুজু-ডিবরাসহ গ্রামের লোক খবর পেয়ে গর্বিত হল খুব। তেল-সিঁদুর মাখিয়ে গোল্লুকে ছেড়ে দেওয়া হল আকাশে। পৃথিবীর লোকজন দেখতে পাচ্ছে না তাকে। মঙ্গল থেকে সে এক ঝুড়ি মাটি পাথর আনবে। সুবর্ণরেখা নদীধারের প্রকাণ্ড মাঠের,

গ্রামের বাঁশ-শ্যাওড়াগাছের বাসিন্দারা, ভুজু-ডিবরারা, নাসার লোকজনেরা সকলে মহাকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কখন কাঁধে শক্তিমান হনুমানের মতো এক ঝুড়ি মঙ্গলের মাটি আর পাথর নিয়ে ধরনীতে নেমে আসবে গোল্লু।

নলিনী বেরার গল্পের মধ্যে মিশে থাকে মানুষ ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন পালা-পার্বণ, পূজা পালনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলে এক আঞ্চলিক পরিমণ্ডল। ছোট থেকে দেখে আসা করম-বাঁধনা, মকর, টুসু, ভাদু, ভেজা-বিঁধাসহ বেশ কিছু গ্রামীণ পরব-উৎসবের দৃশ্য এসেছে নলিনী বেরার গল্পে। হরিনাম সংকীর্তন ও মহোৎসব ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম। সময় মতো বৃষ্টি না হলে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে সমবেত উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। আবার গৃহশান্তির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এই নামসংকীর্তন মহোৎসব হয়। 'শতরঞ্জি' (শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০০৩) গল্পে বিস্তৃতভাবে এসেছে এই মহোৎসবের প্রসঙ্গ। মহোৎসবে উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকে না। লেখক খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন-

> তৃণাদপি সুনীচেন- আজ রামচন্দ্র থেকে ভাঁড়ারী, সকলেরই খাতির কত! গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা, যারা বাপের ধুতি মায়ের শাড়ি কিংবা একেবারে নতুন নতুন জামাকাপড় পরে এসেছে তাদেরই আজ দাপট কত! ইচ্ছা মতো তারা পাতা শতরঞ্জির এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কুদি মেরে দৌড়চ্ছে, শতরঞ্জির ওপরই কানামাছি চোর-চোর দাঁড়িয়া হা-ডু-ডু খেলছে, কেউ কেউ হঠাৎ দলছুট হয়ে মণ্ডপে মূল কীর্তনীয়াদের দলে ভিড়ে দোয়ারকি দিতে দিতে বারকতক ঘুরপাক খেয়ে ফের দলে এসে ভিড়ে যাচ্ছে। দু'ঠোঁটে এমনি ভঙ্গি করছে, যেন- ধুস, আজ কে কাকে মানে, আজ সব মাগনা মাগনা! শতরঞ্জির ওপরই ডাঁই করা হয়েছে। বৈতাল, কুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙা, পুঁইখাড়া, আলু, পটল। একদল ছোকরা হাসি-হাসি মুখ করে সেখানে যত খুশি আনাজপাতি কুটে যাচ্ছে। তাই দিয়ে আজ রাত ১২টায় অষ্টপ্রহরের মহাপ্রসাদের ঘন্ট হবে ...। (২০১৫ : ১৬৯)

খোল-করতালের শব্দে মুখর চারদিক। চৌদ্দটা মণ্ডপে চৌদ্দ রকম নামগান চলছে। কোথাও 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে', কোথাও 'জয় রাধে গোবিন্দ রাধে', কোথাও-বা 'হরে মুরারে মধুকৈটভ ভারে', আর কোথাও 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' চৌদ্দ দল কীর্তনীয়ারা চৌদ্দটা মণ্ডপে পালা করে নামগান করছে। স্মরণীয়, নলিনীর একটা গল্প সংকলনের নাম *চোদ্দমাদল*। চোদ্দটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলির পৃথক কোনও নাম নেই। প্রতিটি গল্পের পটভূমি মেদিনীপুরের পূর্বে উল্লেখিত বিশেষ গ্রামীণ অঞ্চল। ধর্মীয় আফিম যেখানে মানুষ-মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি করে, হিংস্র করে তোলে মানুষকে; সেখানে নলিনী বেরার এই চিত্রাঙ্কন সত্যি অভাবনীয়। তবে এই হাওয়া বেশিক্ষণ বয়ে যায় না। শতরঞ্জি নিয়ে কাবুলিওয়ালার সাথে সোরগোলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঘূর্ণী ঝড়ের মতো একসময় প্রকৃতির নিয়মেই থেমে যায় সব, এটাই তাদের বাস্তবতা।

কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের বিচিত্র রূপী মানুষজন উঠে এসেছে নলিনী বেরার গল্পে। তাঁর 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' (*এই এই লোকগুলো*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮) গল্পের শ্রীকান্ত গ্রামেরই মানুষ। শ্রীকান্ত বেরা, সাং বাছুরখোঁয়াড়, পোঃ রোহিণী, জেলা মেদিনীপুর। ছোটবেলায় স্কুলে যাবে না বলে ধান সেদ্ধ করার বড়ো জালার মধ্যে লুকিয়ে থাকত। ফ্রি প্রাইমারির হেডস্যার বাড়িতে এসে 'বেছে বেছে একটা জালার মধ্যে হাত গলিয়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলবেন শ্রীকান্তকে। মাটি থেকে কম করেও ছ'ইঞ্চি ওপরে। পরিহাস করে বলবেন, এই কিনা শ্রীকান্ত ?' (১৯৮৮ : ৭০)।

এই শ্রীকান্ত পড়াশুনো ছেড়ে কৃষিকাজে লেগে পড়ে। বাবা-মা দু'জন মারা যাবার পর ভাই নলিনীকান্তকে পড়ানোর দায়িত্ব তো তার। যে কোনো মূল্যেই মানুষ করতে হবে ভাইকে। নিজে পড়াশুনো করতে পারেনি তেমন করে, ছোটোভাই নলিনীকান্ত তার অহংকার। তার পড়ানোর খরচ জোগাতে, বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে জমি জিরেত অনেকটা চলে যায়। শেষ সম্বল তার প্রিয় বলদ

জোড়াটাও চলে যায় কাকার বেইমানিতে। ভাই নলিনীকান্ত ভালো চাকরি করে। সেই টাকায় একটা বাড়ি করে দিলেও দরজা-জানালা বসাতে পারে না। কিন্তু শ্রীকান্ত তার জন্য চিন্তা করে না। সে শুধু একজোড়া বলদ চায়। তা দিয়ে সবকিছু করে ফেলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাই কিনে দিতে পারে না। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও ভাইকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'তুই একদম চিন্তা করিস না ছোটোভাই আমাকে এক হাল গরু কিনে দে, দেখবি ওই দিয়ে খেটে ঘরের দরজা-জানালা সব আমি করে ফেলব।' (১৯৮৮ : ৭২)। একজন কৃষকের কাছে বসত ভিটের থেকে একজোড়া বলদ অনেক বেশি জরুরি, শ্রীকান্ত তার ভাইকে সেটাই বোঝাতে চেয়েছে। শহরের শিক্ষিত ভাই-র প্রতি গ্রামের অশিক্ষিত দাদার অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকান্তর মধ্যে।

ভাই ঘরে ফিরলে তাকে খাওয়ানোর জন্য বেছে বেছে বাঁশ পতরি শুঁটকি কিনল গোটা কতক। পাল জমিনের বেগুন পুড়িয়ে তার মধ্যে মুচমুচে পোড়া বাঁশ পতরি শুকা মাছ গুঁজে একটু নুন লঙ্কা সরষের তেল একফোঁটা মিশিয়ে একসঙ্গে চটকে আহত করে খেতে কী ভালোই না বাসত নলিনী ওরফে ছুটু। মেয়ে সুরুবুড়িকে দিয়ে শাক তোলালো হরেকরকম- চালধোয়া, ঘোড়াকানা, নাহাঙাশাক। নেহাৎ কুরকুটের সময় নয় এখন, না হলে লোধা-লোধানীদের দিয়ে কুরকুটও না আনিয়ে ছাড়ত না শ্রীকান্ত। শিলনোড়ায় কুরকুট বেটে শালপাতার ঠোঙায় মুড়ে পুড়িয়ে ছোটবেলায় সে অনেক খেয়েছে। আজ না হয় নলিনী একটু বাবু হয়েছে। আপনার মনে হেসে শ্রীকান্ত চলে গেল খাল ধারে সাপখোপের গর্তে ডিমাল কাঁকড়া ধরতে। নলিনীকান্তকে সে আজ কাঁকড়ার ঝোল খাওয়াবে।

নলিনী বেরার অধিকাংশ গল্প এই বাতাবরণে তৈরি। 'হোমগার্ডের জামা', 'যৌতুক', 'ঘবা তিহার গল্প', 'ভূতজ্যোৎস্না', 'শীতলামঙ্গল', 'বর্ষামঙ্গল', 'নৌকাবিলাস', 'মানুষ রতনেরা', 'জলের মানুষ ডাঙার মানুষ', 'চারআনা আটআনার প্রেম', 'ঝরাপালকের জাদু', 'আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ' প্রভৃতি গল্প পাঠককে সেই নদীর ওপারে নিয়ে যায়। 'ঘবা তিহা-র গল্প'এ বিশ্ব মনে মনে জানে, বিষয়-আশয়, জমি-জমা-পুকুর তাকে আর বাঁচাবে না। শহরে চাকরিতে তাকে যেতেই হবে– এটাই তার কষ্ট। 'ভূতজ্যোৎস্না' গল্পে কংসহরির ডাকে সরিন্দর সাড়া দেয় না– গ্রামের ভূতজ্যোৎস্না ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। 'বর্ষামঙ্গল' গল্পে আছে খুব বৃষ্টি পড়ার ছবি। গল্পকার আঁকেন বৃষ্টির সঙ্গে গুড়ুনটলু (হেলে সাপের মণ্ড) করে পড়া হলহলিয়া সাপের (হেলে সাপ) দৃশ্য। এটিও কালক্রমে মিথ্যা হয়ে যায়। এভাবেই নানা বিশ্বাস সংস্কার হারিয়ে যায়। *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর ভূমিকায় সমালোচক অমলেন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'নলিনী বেরার শিল্পীসত্তার সমগ্রতা জুড়েই গ্রাম বা পল্লী প্রকৃতির সংস্কৃতি। ... আকাশ মাঠ গাছপালা পশুপাখি নদীনালার দিগন্তপ্রসারে মানুষই তাঁর সৃজনচেতনার অন্তর্বীজ। ... নাবালকসদৃশ এই মানবগোষ্ঠীই যে তাঁর সর্বাধিক আপন, বাংলার গ্রামই তাঁর মানসচৈতন্যের যথার্থ আশ্রয়ভূমি নলিনী সেটা জানে।' (২০০৩ : ভূমিকাংশ)। নলিনী বেরার গল্পে পাওয়া যায় এমনই সরল মানুষ আর ততোধিক সরল জীবনের কাহিনি।

এইভাবে আঞ্চলিক ভাষা ও কাহিনিবিন্যাস- উভয়কেই সমান্তরালে রেখে প্রান্তিক জীবন-যাপনের পারস্পরিক টানাপড়েনের নানা ছাঁচে গড়ে ওঠে নলিনী বেরার ছোটগল্প। স্বভূমি-স্বজাতির বিচিত্র মানব প্রান্তর হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের বিচিত্র ক্ষেত্র। তাঁর গল্প বক্তব্যের ওজনে যতটা না ভারী, তার থেকে চিন্তার গভীরতায় স্পষ্ট আর উপস্থাপনার শৈলীতে বিনির্মিত হয়। দেশজ লোকজ রীতির অনুসরণে বৃত্তান্ত, কথকতা, উপকথা, লোককথার আদলে গড়ে তুলেন আপণ গল্পের ভুবন। কখনো কখনো আখ্যানভাগকে বেঁধে দেন রামায়ণ বা মহাভারতের ছাঁচে। ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন নয় বরং যথার্থ ভারতীয় বাস্তবতাকে খুঁজে দেখাই গল্পকারের অন্বিষ্ট বলে মনে হয়। তাই সুগভীর সামাজিক দায়িত্ববোধে জারিত হয়ে পাঠের আবেশ নয়, বরং আবেশ কাটানো এক বাস্তবতার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে নলিনী বেরার গল্প। সংযুক্তি-বিযুক্তির মন্থন ক্রিয়া শেষে যা ইতিমূলকতার দর্পণে প্রতিফলিত হয়। যেখানে ভারতবর্ষের বিচিত্র জনপদের প্রান্তীয় জীবনজিজ্ঞাসার

সুতীব্র উচ্চারণে তাঁর গল্প হয়ে উঠে প্রকৃত ভারতীয় বাস্তবতার শিল্পরূপ। এভাবেই জীবনযাপনের জটিলতায় সমসাময়িকতা আর ইতিহাসের সমন্বয়ে গল্প আস্বাদনের এক নতুন মাত্রা তৈরি করেন নলিনী বেরা।

গ্রন্থপঞ্জি :

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৫), *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'বিশ বছর/১৮৯১-২০১০*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আমীনুর রহমান (২০১৪), 'ইম্পিরিয়ালিজম থেকে পোস্টকলোয়িালিজম', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব*, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা

ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৯৭), *জাতিভেদ*, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী

নলিনী বেরা (১৯৮৮), *এই এই লোকগুলো*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
(২০০৩), *শ্রেষ্ঠগল্প*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
(২০১৫), *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বীরেন্দ্র দত্ত (২০০৪), *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, ৫ম সং, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা (২০২২), 'বাংলা গল্পের পালাবদল–৭', https://www.jaladarchi.com 13 August 2022

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা (২০১৪), *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২০০৯), *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

রণজিৎ কর (২০০৯), *প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিকজন*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা

শান্তনু চক্রবর্তী (২০১৯), 'নদীর নাম সুবর্ণরেখা', https://parabaas.com 30 September 2019

সসীমকুমার বাড়ৈ (২০২১), 'নলিনী বেরার আখ্যান : প্রান্তিক জীবনের যাপিত চরিত', https://pagefournews.com 22 January 2021

সাঈদ-উর রহমান (২০১৩), *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা

সুনীতি সরকার (২০২৩), *নলিনী বেরার জীবন ও নির্বাচিত সাহিত্য সাধনার একটি সমীক্ষা*,

https://www.tirj.org.in, Volume-3, Issue-11, April, Article-26, e ISSN : 2583 0848

সুমন সাজ্জাদ (২০১১), *প্রকৃতি, প্রান্তিকতা ও জাতিসত্তার সাহিত্য*, আবহমান প্রকাশনী, ঢাকা

সুমিতা চক্রবর্তী (২০০৪), *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

হিতেশরঞ্জন সান্যাল (১৯৯৮), 'বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি', *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, (সম্পাদক : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত), আই সি বি এস, কলকাতা

[Abstract : Nalini Bera (b. 1952) is a distinct name in Bengali fiction. He is one of the companions of the revival in Bengali fiction since the seventies. At this time, the trend of Bengali fiction changed due to the political context of the attempt to surround the city with the village. A bunch of new writers came up from different districts. In their writings, the narratives of the people close to the soil of the villages like the districts of 24 Parganas, Howrah, Purulia, Bankura, Maldah, Murshidabad etc. took shape. Both the type and metal of these writings are different. They gave art form to the story of the homeland,

the lives of their relatives, their not being found. It was at this time that Nalini Bera came from Midnipur district of Odisha. The one who has seen his land with great compassion, read the mythology of his region, history and lived the folk life of that region and he enriched his culture with his art form. The aim of the present study is not only to paint a diverse portrait of the diverse townships on the banks of the Subarnarekha river on the West Bengal-Odisha border, but also to find out how his story has become an art form of the real Indian reality in the vivid enunciation of their marginal lives.]